গল্প এক আসামী পাঁচ

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

গল্পটা সেই পুরনো ধাঁচের। অপেক্ষাকৃত কম অবস্থাপন্ন ঘরের সৌমিক দত্ত প্রেমে পড়েছিল কলকাতার নামী ব্যারিস্টার রণবীর রায়ের মেয়ে উৎসা রায়ের। এবং ভাইসি ভার্সা। সৌমিকের বয়স পঁচিশ। তার বাবা ঋষি দত্ত ভবানীপুরের একটা ছোটখাটো ব্যবসা করে মোটামুটি স্বচ্ছল। কিন্তু আভিজাত্য বলতে যা বোঝায় তা তাদের পরিবারে অনায়াত্ত। তবে সৌমিক লেখাপড়ায় ভাল। এম.বি.এ. করে এখানে ওখানে লাগাতার ইন্টারভিউ দেওয়ার প'র বছরখানেক হল জুটিয়ে ফেলেছে একটা নামী কোম্পানির মার্কেটিং এক্সিকিউটি ভর চাকরি।

তুলনায় ব্যারিস্টার রণবীর রায়ের বিশাল তিনতলা বাড়িটাই একটা দ্রষ্টব্য। তাঁর পরিবারের ঠাটবাট প্রায় ব্যারনদের মতো। চলনে-বলনে উপচে পড়ে আভিজাত্যের ঢল। উৎসা রণবীরের একমাত্র কন্যা। মানুষ হয়েছে অপর্যাপ্ত বৈভবের ভেতর। সে কী করে যে সৌমিক দত্তের মতো সাধারণ পরিবারের ছেলের প্রেমে পড়ল তা কোনও ফর্মুলায় ফেলা যায় না। আর কে না জানে প্রেম চিরকালই ফর্মুলা বহির্ভূত।

সৌমিক আর উৎসার প্রেমের বয়স পৌনে তিন। কিন্তু তিনটি কারণে এ যাবৎ তাদের প্রেম কুসুম ফোটাতে পারছিল না। তা সৌমিকদের পরিবারকে রণবীর রায়দের পরিবারের প্রত্যেকেরই (উৎসা ছাড়া) ঘোর অপছন্দ। দুই সৌমিকের চাকরি পাওয়া বিলম্বিত হচ্ছিল। তিন উৎসার আঠারো বছর এখনো পূর্ণ হয়নি।

তিনটি কারণে র মধ্যে প্রথমটিই সবচেয়ে জটিল ও দুরারোগ্য। দ্বিতীয় সমস্যাটি মিটে যাওয়ায় ওরা অপেক্ষা করছিল তৃতীয় সমস্যা মেটা পর্যন্ত। দু'হাজার সালের সাতই মার্চ বিকেলে রবীন্দ্রসরোবরের মাঠে এসেই ঘাস চিবুতে চিবুতে উৎসা এক পাক ঘুরে নিল, তারপর বীরাঙ্গনার মতো ঘোষণা করল, ইয়েসটারডে আই ওয়াজ সেভেনটিন, টুডে আই অ্যাম এইট্টিন।

উনিশতম জন্মদিনে আজ বিকেলে তাদের বাড়িতে কেক-কাটার উৎসব।

আঠারো বছর পূর্ণ হওয়ার বিষয়টি এর আগেও ওদের আলোচনার মধ্যে ঘুরেফিরে এসেছে। উৎসার উৎসাহই বেশি ছিল। সৌমিকও মাঝেমধ্যে মৃদু হেসে টিজ করেছে, 'বেশি কথা বলবে না। মাইন্ড ইট তুমি এখনও নাবালিকা।' কখনও বলেছে, 'এখনও সাবালিকা হওনি, এর মধ্যে বিয়ে করার এত শখ!' আজ অবশ্য তেমন উচ্ছ্বসিত হল না, শুধু বলল, যাক, অ্যাদ্দিনে নাবালিকার দুর্নামটা অন্তত ঘুচল।

উৎসা অবশ্য এখানেই থামল না, বলল, শুধু ঘুচল বলে আলোচনায় ইতি দিলে চলবে না। এবার বিয়েটার ব্যবস্থাও করতে হবে।

সৌমিক বলল, তোমার বাবা তো আমার সঙ্গে বিয়ে দেবে না। বলেছেন 'ভিখিরির ছেলে'।

উৎসা গম্ভীর হয়, সে তখন আমাদের ব্যাপারটা সদ্য জানাজানি হয়েছে। রাগের মাথায় বলে ফেলেছেন। তা ছাড়া তখনও তো তোমাদের গাড়ি কেনা হয়নি। গাড়ি কেনার পর এখন বাবা একটু সমঝে গেছেন।

—তা গেলে কী হবে! তা হলেও আমার সঙ্গে বিয়েতে রাজি হবেন না।

উৎসার মুখে সামান্য রক্তবর্ণের ছিটে। চট করে রাগ এসে যায় ওর শরীরে। কোনওক্রমে দমন করে বলল, রাজি যদি কখনও না-ই হন বাবা, তা হলে কি আমাদের বিয়েটা হবে না!

—রাজি না হলে কি করে হবে! তোমাকে নিয়ে কি পালিয়ে যাব।

উৎসাকে বেশ বেপরোয়া দেখায়। সৌমিক সন্ত্রস্ত হল। ওর গোলচাঁদের মুখ যখন উচ্ছল, তখন ভারী মিষ্টি। কিন্তু যখন ক্রুদ্ধ, দপদপ করে জ্বলতে থাকে দু'চোখের মণি। বলল, দরকার হলে তাই যেতে হবে।

সৌমিকদের বাড়ি থেকে উৎসাদের বাড়ি মাত্র শ'দেড়েক গজের ব্যবধান। দুজনের মধ্যে এতদিনের মেলামেশা, কত জল্পনা-কল্পনা, কিন্তু দুজনে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে এরকম দুঃসাহসী পরিকল্পনা কখনও হয়নি। তায় পাড়ায় দুটি পরিবারের বাস। সৌমিক আর উৎসা একসঙ্গে উধাও হয়ে গেলে তার প্রতিহিংসা কী ভয়াবহ হবে তা ভাবতে গিয়েও চমকে ওঠে সৌমিক। তার বাবা ছোট ব্যবসায়ী, মা ইস্কুল-শিক্ষিকা, উৎসাদের মতো বিশাল আভিজাত্য না থাকলেও পাড়ার লোকজনের কাছে তাদেরও তো একটা অস্তিত্ব আছে।

সৌমিককে এত জটিল ভাবনায় মূক ও বধির থাকতে দেখে উৎসাকে অস্থির-অস্থির দেখায়, কী হল! ওরকম আসামি-আসামি মুখ করে তাকিয়ে আছ কেন! তুমি জানো, বাবা আমার জন্যে ছেলে দেখেছেন? যে-কোনও দিন বসিয়ে দেবেন বিয়ের পিঁড়িতে।

কথাটা মাস ছয়েক আগে আবার বলেছিল উৎসা। তারপর কী কারণে যেন দেখাদেখিটা চাপা পড়ে যায়। বোধহয় উৎসার তখন উচ্চমাধ্যমিক। এতদিন পর আবার।

সৌমিককে তবুও নিশ্চুপ দেখে উৎসা গলা উঁচুতে তোলে, বাবা এবার একদম মরিয়া। গত সপ্তাহে নোটিস দিয়েছেন, দেখতে আসবে। ছেলে ডাক্তারি পাশ করে এবার বিলেত যাবে। বিয়ে করে বউ নিয়ে। তাই ওদের এত তাড়াহুড়ো।

সৌমিক বেশ সমস্যায় পড়ে। এতদিন উৎসার আঠারো হয়নি এরকম একটা প্রতিবন্ধক থাকায় খুব বেশি জোরাজুরি করেনি উৎসা। আজ একেবারে যাকে বলে ডেসপ্যারেট।

সেদিন সন্ধেয় প্রবল টানাপোড়েন, কথা-ছোড়াছুড়ি, বাদানুবাদের পর দুই প্রেমিক-প্রেমিকা সিদ্ধান্ত নিল, দিনদুয়েক পর এভাবে দেখা করে আর বাড়ির পথ ধরবে না। বেরিয়ে পড়বে একসঙ্গে। কোনও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়াই। সঙ্গে থাকবে দুজনের দুটো কিটব্যাগ।

২

মাননীয়
ইন্সপেক্টর-ইন-চার্জ,
....থানা সমীপেষু
মহাশয়,

অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত জানাইতেছি যে, আমার একমাত্র কন্যা কুমারী উৎসা রায় গতকাল বৈকালে 'লাইব্রেরিতে বই আনতে যাচ্ছি' বলিয়া বাহির হয়। অন্য অন্য দিন সন্ধ্যার পর যেমন বাড়ি ফিরিয়া আসে, কাল অনেক রাত পর্যন্ত না ফেরায় আমরা সকলে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়ি। অতঃপর সমস্ত আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য সম্ভাব্য জায়গায় অনুসন্ধান করিয়াও তাহার কোনও খোঁজ পাই নাই।

ইতিমধ্যে গভীর রাতে সংবাদ পাইলাম আমাদের এক প্রতিবেশী শ্রী ঋষি দত্তর পুত্র শ্রী সৌমিক দত্ত নামে একটি যুবকও বাড়িতে ফিরিয়া আসে নাই। অনুমান হইতেছে ইহার মধ্যে একটি গভীর ষড়যন্ত্র আছে। সৌমিক প্রায়শ আমার কন্যাকে নানাভাবে উত্যক্ত করিত। তাহা আমার নজরে আসিয়াছিল। শ্রী ঋষি দত্তর বাড়ি আমার বাড়ির অতি নিকটে। তাঁহাকে আমি বহুদিন যাবৎ উত্তমরূপে চিনি। সামান্য একটা রঙের ব্যবসা করিয়া সংসার চালাইতেন। তাঁর স্ত্রী কয়েক বৎসর হইল একটি

স্কুল-শিক্ষিকার চাকরি পাইয়াছেন। গত দুই তিন বৎসর যাবৎ লক্ষ্য করিতেছি শ্রী ঋষি দত্ত হঠাৎ বিপুলভাবে ফুলিয়া-ফাঁপিয়া উঠিতেছেন। সামান্য রঙের ব্যবসা করিয়া এমন ধনী ব্যক্তি হওয়া সম্ভবপর নয়। সম্ভবত কোনও দুনম্বরি ব্যবসার মাধ্যমে তাঁহার এই প্রভূত রোজগার।

ঋষি দত্তর পুত্র সৌমিক দত্ত যে আমার কন্যা উৎসার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে চেষ্টা চালাইতেছে তাহা আমি বেশ কয়েকবার ঋষি দত্তকে জানাই ও এ-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে বলি, কিন্তু তিনি আমার অনুরোধে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেন নাই, উপরন্তু তাঁহার পুত্রকে প্রশ্রয় দিয়াছেন। প্রশ্রয় দিবার কারণ আমার বিপুল সম্পত্তি। একথা ঋষি দত্ত সম্যক জানেন যে, উৎসা আমার একমাত্র কন্যা ও আমার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। এই সম্পত্তির লোভেই ঋষি দত্ত তাঁহার পুত্রকে উস্কানি দিয়া এরূপ একটি জঘন্য কাজ সম্পন্ন করাইয়াছেন। আপনি অবিলম্বে সমস্ত বিষয় তদন্ত করিয়া আমার কন্যাকে এখনই উদ্ধার করিয়া দিন। এ প্রসঙ্গে জানাই যে, আমার কন্যা এখনও নাবালিকা। স্কুল-সার্টিফিকেটে যে তারিখই লেখা থাকুক না কেন, তাহার বয়স এখনও অষ্টাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হয় নাই। অতএব নাবালিকা হরণের দায়ে শ্রী সৌমিক দত্ত ও এই ষড়যন্ত্রে মূল আসামি ঋষি দত্তকে গ্রেফতার করিয়া ও আমার কন্যাকে আমার কাছে ফিরাইয়া দিয়া আমার সম্মান রক্ষা করুন। আমার স্ত্রী ইতিমধ্যেই শয্যাগত। ইতি।

ভবদীয়— শ্রী রণবীর রায়।

কালো কালিতে জড়ানো অক্ষরের চিঠিটা বার দুই মনোযোগ দিয়ে পড়লেন কলকাতার শহরতলির এক থানার ইন্সপেক্টর-ইন-চার্জ আকিঞ্চন ভদ্র। তাঁর ফোলা-ফোলা মুখের পেশীগুলো নড়াচড়া করছিল একটি বিশেষ ভঙ্গিতে। চিঠির বক্তব্য আত্মস্থ করার পর চোখ তেরচা করে তাকালেন সামনে আয়েস করে বসা সাব-ইন্সপেক্টর সুকল্যাণ দে-র দিকে, ঋষি দত্ত কোন লোকটা, মেজবাবু!

মেজবাবু তাঁর শ্যামলা গালে একটা পান ঠেসে রাখায় ট্যাবলা হয়ে ফুলে আছে মুখের এক দিকে। তাতে তাঁর মুখগহ্বর থেকে বাক্যগুলো বেরোয় চেবানো-চেবানো স্বরে। বললেন, অই যে বেঁটে থ্যাবড়ামুখো লোকটা। একটা চকোলেট রঙের অ্যাম্বাসাডার কিনে খুব হুস হুস করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনি দেখেননি, বড়বাবু!

বড়বাবু তাঁর মানসচক্ষে নতুন ঝকঝকে গাড়িখানা আবার অবলোকন করে হঠাৎ হুঙ্কার ছাড়লেন, শালা!

—শালার দুটো পয়সা হয়ে খুব চুলকুনি বেড়েছে। আমার বাড়িটায় রং করব বলে ব্যাটার দোকানে গিয়েছিলাম। সামান্য দু-চার টাকা কমিয়ে বলে কিনা এর চেয়ে কমে দিলে আমার লস হয়ে যাবে। আপনি পুলিশের লোক বলে কেনা দামে

দিচ্ছি।

বড়বাবু হাতের চিঠিটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আর একবার দেখে 'মজা দেখাচ্ছি শালাকে' বলে তার কোণে একটা নোট লিখলেন। সেটি মেজবাবুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, শালার ছেলেটা এক ব্যারিস্টারের নাবালিকা মেয়েকে ফুসলে নিয়ে পালিয়েছে। কোনও ট্রেস পাওয়া যাচ্ছে না। লোকটাকে আজ সন্ধেয় তুলে নিয়ে আসুন তো। ভাল করে কড়কে দিলে সুড়সুড় করে বার করে দেবে দুটোকে।

মেজবাবু কাগজখণ্ডটি পকেটে ভরতে ভরতে বললেন, হাতে কাঁচা পয়সা এলে লোকে হাতির পাঁচ পা দেখে। এরা বোধহয় দশ পা দেখেছে। এইসব উঠতি বড়লোকদের বেশ করে দু ঘা কষিয়ে দিলে তবে সিধে হয়।

সেদিন ভরসন্ধেয় জিপ ও দুজন কনস্টেবল সহযোগে ঋষি দত্তর সদ্য রং-করা দোতলা বাড়িটিতে সাব-ইন্সপেক্টর সুকল্যাণ দে-র অভিযান অবশ্যই পুরোপুরি দানা বাঁধল না যেহেতু ঋষি দত্ত কর্মসূত্রে বাইরের কোনও জেলায় পরিভ্রমণরত থাকায় তাঁর স্ত্রী বিনীতা দত্ত জানালেন 'ওনার ফিরতে দু-তিন দিন দেরি হবে। এলে দেখা করতে বলব।' মেজবাবু ঠারেঠোরে জানতে চাইলেন ঋষি দত্ত কবে বাইরে গেছেন, কোথায় ও কেন, তাঁর এই ভ্রমণের সঙ্গে পুত্র সৌমিকের উৎসা-সহ অন্তর্ধানের কোনও সুক্ষ্ম ও চতুর যোগাযোগ আছে কি না। তাতে বিনীতা দত্ত অত্যন্ত কুপিত হয়ে জানালেন, 'আমরা মরছি আমাদের জ্বালায়, আপনি এসেছেন তার ওপর নুন দিতে!' মেজবাবু তাতে আরও রুষ্ট হয়ে বললেন, 'তা হলে আপনিই চলুন। বড়বাবু ডেকেছেন।' বড়বাবুর নাম শুনেও কোনও হেলদোল হয়নি বিনীতা দত্তর, বললেন, এখন এই রাতের বেলায় থানায় যেতে পারব না। মন মেজাজ খুব খারাপ। আমার হাজব্যান্ডও বাড়িতে নেই, কাল সকালে যাব।

সে কথা বড়বাবুর কাছে পল্লবিত ভঙ্গিতে পেশ করতেই থানার দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইন-চার্জের গালের পেশি ফুলে দ্বিগুণ, চোখে ঘূর্ণি। দাগী আসামিকে ট্যাকল করার সময় যে রকম রক্ত চলকে ওঠে মাথায় তেমনই রুদ্র মূর্তি, এ সবই তা'লে কাঁচা পয়সার গরম, হ্যাঁ?

৩

বিনীতা দত্ত এলেন পরদিন বেলা ন'টা নাগাদ, তাঁদের চকোলেট রঙের অ্যাম্বাসাডারে চড়ে। গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে এল তাঁদের মাস মাইনের ড্রাইভার চন্দন। বিনীতার পরনে একটা দামী জামদানি, তাতে হালকা সবুজ আর হালকা কমলা সুতোর কারুকাজ। বয়স বছর পঁয়তাল্লিশের মতো। দোহারা গড়ন বলে

বয়সের তুলনায় অনেকখানি যুবতী দেখায়। গাড়ি থেকে নেমে চন্দনকে অপেক্ষা করতে বললেন। তারপর দ্রুত পায়ে থানার সিঁড়ি পেরিয়ে, বারান্দা অতিক্রম করে সেঁধুতে চাইলেন ভেতরে। সে সময় বারান্দায় টহলরত সেন্ট্রি হাঁ হাঁ করে বাধা দেয়। আপনি কার সঙ্গে দেখা করবেন?

বিনীতা থমকে দাঁড়ান, বড়বাবুর সঙ্গে। কাল সন্ধেয় একজন অফিসার গিয়ে বলে এসেছিলেন—

—বড়বাবু এখন ব্যস্ত। কথা বলতে পারবেন না। আপনি বারান্দায় ওই বেঞ্চিতে বসুন।

সরু একটা বেঞ্চি বারান্দার একদিকে অবহেলায় পাতা। তাতে বসে আছে আরও তিনজন। দর্শনার্থীই সম্ভবত। তিনজনের চেহারাই হয় পকেটমার, না হয় চোর, না হয় ওয়াগনব্রেকারদের মতো। তাদের পাশে বিনীতা দত্তর মতো সুবেশা মহিলা বসবেন তা প্রবৃত্তিতে কুলোল না। বাধ্য হয়ে বললেন, বড়বাবুকে তা হলে একবার খবর দিন আমি এসেছি।

সেন্ট্রির কণ্ঠস্বর এবার উদ্ধত হয়, আমার ওপর হুকুম আছে এখন কাউকে ভেতরে ঢুকতে না দিতে। ভি.আই.পি আসবেন, তা নিয়ে কথাবার্তা চলছে।

ভারী অসহায় দেখাল বিনীতা দত্তকে। থানার বারান্দায় ওই ভিড়াক্রান্ত বেঞ্চিটি ছাড়া আর কোনও বসার জায়গা নেই। এদিক-ওদিক তাকিয়ে তার অসহায়তা আরও বাড়ল কারণ বেঞ্চিতে-বসা ওই সন্দেহজনক তিনজন ছাড়াও যেসব বিচিত্র চরিত্র ঘোরাঘুরি করছে থানার ভেতরে ও বাইরে তারা সবই চোর বদমাশ গুণ্ডাগোছের লোক। ভদ্রলোক বলতে যা বোঝায় তা এই বিনীতা দত্তই একা।

বাধ্য হয়ে বিনীতাকে দাঁড়াতে হল বারান্দার এক কোণে, অপরাধী চেহারার লোকগুলোর আওতা থেকে নিজেকে যথাসম্ভব বাঁচিয়ে। হয়তো ভাবছিলেন পুলিশ ইন্সপেক্টরের মিটিং কতই বা দীর্ঘায়িত হবে। নিশ্চয়ই একটু পরেই ডাক পড়বে ভেতরে।

কিন্তু নটা থেকে দশটা, দশটা থেকে এগারোটা, ঠায় দুটি ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার পরও ভেতর থেকে খবর আসার কোনও লক্ষণই নেই। কিছুক্ষণ অসহিষ্ণু হয়ে পায়চারি করলেন বারান্দায়, তারপর প্রহরারত সেন্ট্রিকে গিয়ে বললেন, বড়বাবুর মিটিং এখনো শেষ হয়নি?

—হলে জানতে পারবেন। সেন্ট্রির ব্যঙ্গমিশ্রিত গলায় সংক্ষিপ্ত উত্তর।

বিনীতা দত্তর চোখমুখে রক্তের সঞ্চার ঘটল। পরশু রাতে সৌমিকের একটা টেলিফোন, তারপর থেকেই তাঁদের সরল একমুখী জীবনযাপন হঠাৎই বহুমাত্রিক হয়ে পড়েছে। সৌমিক যে তাঁদের পাড়ারই একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছে তা

তিনি জানতেন। কয়েকবার বারণও করেছেন এই বলে যে, ওরা বড়লোক, উন্নাসিক, ওদের সঙ্গে তুই মানিয়ে চলতে পারবি না। কিন্তু সৌমিক হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, 'কী যে বল, মা, বিয়ে তো উৎসার বাবাকে করব না, করব উৎসাকে। ও আমার জন্যে একদম পাগল।' তারপর পরশু খেয়েদেয়ে অফিসে গেল। তখনও কিছু বলেনি তাঁকে, অনেক রাতে টেলিফোনে বলল, 'মা, আমি উৎসাকে বিয়ে করেছি, কয়েকদিন পরে ফিরব।' ব্যস, খট করে কেটে দিল লাইনটা। এদিকে সৌমিকের বাবাও বাড়ি নেই। কাল সারাদিন কিছুই বুঝে উঠতে পারেননি কী করবেন কাকে বলবেন ব্যাপারটা। বিকেলে উৎসার বাবা তাদের বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে কর্কশ কণ্ঠে কিছু অশ্রাব্য কথা শুনিয়ে গেছেন। তারপর রাতে পুলিশ। আজ সকালে আবার এত হেনস্থা।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে টনটন করতে থাকে পাদুটো। ইতিমধ্যে বেঞ্চিটা খালি হয়ে যেতে সেখানে বসলেন বিনীতা। বসতে কিরকম গা ঘিনঘিন করছিল। যারা এতক্ষণ বসেছিল কেউ পায়ের ওপর পা তুলে, কেউ উবু হয়ে। কেউ এক পা বেঞ্চে এক পা নীচে রেখে। তারা বিড়ির পর বিড়ি খাচ্ছিল বলে একটা গুমোট তামাকের গন্ধ মেশানো বাতাস ঘুরছে বেঞ্চিতে ও বেঞ্চির চারপাশে। একটা ওয়াক্ গলা থেকে উঠে এল তাঁর অজান্তে।

এ হেন বিবমিষার মধ্যে নজরে এল থানার ভেতর থেকে দুজন পুলিশ অফিসার বুটে গটগট শব্দ তুলে হঠাৎ বাইরে। ডানদিকের বেঞ্চিতে বসা বিনীতার দিকে এক ঝলক চাউনি ছুড়ে দিয়ে গিয়ে বসলেন কম্পাউন্ডে অপেক্ষারত জিপটিতে। তক্ষুনি ধুলো উড়িয়ে গর্জন করে হুস করে বেরিয়ে যেতেই বিস্মিত বিনীতা উঠে এগিয়ে গেলেন সেন্ট্রির দিকে, কী হল, বড়বাবু কি বেরিয়ে গেলেন?

—হ্যাঁ। এনকোয়ারিতে গেলেন। খুব জরুরি।

—তা হলে আমাকে যে বসিয়ে রাখা হল এতক্ষণ?

—বড়বাবু যাওয়ার সময় বলে গেলেন আপনাকে আরও কিছুক্ষণ বসতে হবে। উনি ফিরে এসে আপনাকে জেরা করবেন।

—জেরা! শব্দটিতে কীরকম অপমান-অপমান গন্ধ। পুলিশ অফিসাররা থানায় আসামিদেরই এভাবে ডেকে এসে বসিয়ে রাখে ও জেরা করে জানতেন বিনীতা। এখন তাঁকেও—

বিনীতার সমস্ত শরীর জুড়ে এখন অস্বস্তি। সেই বেলা নটার সময় থানায় ঢুকেছেন, এখন সাড়ে এগারোটা। এতক্ষণের মধ্যে তাঁকে থানার ভেতরে পর্যন্ত ঢুকতে দেওয়া হয়নি। বারান্দায় ভ্যাপসা গরম আর বিশ্রী গন্ধের মধ্যে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে একজন দাগী আসামির মতোই। মহিলা বলে সামান্যতম কার্টসিও

দেখানো হয়নি।

তাঁদের চকোলেট রঙের অ্যাম্বাসাডারটা একটু দূরেই দাঁড়িয়ে। চন্দনের যা অভ্যাস, কোথাও আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলেও সে চট করে একঝলক ঘুমিয়ে নেয়। তার অবশ্য একটা কারণও আছে। ঋষি দত্ত বেশিরভাগ দিনই সকালে বেরিয়ে সারা কলকাতা চক্কর মেরে বেশি রাত করে বাড়ি ফেরেন। এত খাটাখাটুনি যায় বলেই সে পট পট করে যেখানে-সেখানে ঘুমিয়ে পড়তে পারে। এখন ও নিশ্চয় স্টিয়ারিঙের নীচে মাথাটা রেখে ঘুমিয়ে কাদা।

ঠায় আরও একঘণ্টা বসার পরে জিপটা ফিরে এল। জিপ থেকে দুই অফিসার নেমে এলেন সেরকমই গটগট শব্দে। বিনীতার দিকে একবার আড়চোখে দৃষ্টিও।

বিনীতা তখন বেঞ্চি থেকে উঠে অস্থিরভাবে উঁকি মারলেন ভেতরের দিকে। কয়েকজন উর্দিপরা অফিসার আর কনস্টেবল কেউ চেয়ারে বসে কাজ করছে কেউ দাঁড়িয়ে গুলতানি মারছে অলস ভঙ্গিতে। একজন মহিলা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে ঠায়, তাতে কারও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। বিনীতা যখন মরিয়া হয়ে ভাবছেন এবার কোনও বাধা না মেনে ভেতরে ঢুকবেন ও জানতে চাইবেন কেন তাঁকে থানায় আসতে বলা হয়েছে, সে সময় ভেতর থেকে একজন হোমগার্ড এসে হাত নেড়ে ডাকল, আপনাকে বড়বাবু ডাকছেন।

অফিসঘরটা পেরিয়ে জোড়া-জোড়া চোখের লেহন সামলে বিনীতা এগিয়ে গেলেন, দরজায় পর্দা টাঙানো ও দেওয়ালে নেমপ্লেট লাগানো ঘরটার দিকে। এটাই বড়বাবুর চেম্বার। ভেতরে নাতি-প্রশস্ত ঘরে কিছু চেয়ার-টেবিল। দেওয়ালে খুন-রাহাজানি, চুরির হিসেব লেখা চার্ট। ও পাশের চেয়ারে একটু আগের দেখা লম্বা গোঁফঅলা উর্দিপরিহিত পুলিশ অফিসার। উর্দির পকেটে পুলিশটির তক্‌মা পাকানো দড়িদড়া। তার চোয়ালশক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বিনীতা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আমাকে থানায় আসতে বলেছিলেন?

ইন্সপেক্টর কী একটা কাজ করছিলেন মুখ নিচু করে, কিছুক্ষণ সময় নিলেন মুখ তুলতে, তারপর কর্কশ কণ্ঠে বললেন, বসুন।

বিনীতা বসতেই পরক্ষণে তার জেরা শুরু, আপনার ছেলে সৌমিক দত্ত আপনাদের পাড়ার একটি নাবালিকা মেয়েকে তুলে নিয়ে পালিয়েছে, জানেন নিশ্চয়ই।

বিনীতা চুপ করে রইলেন। এ-প্রশ্নের জবাব দেওয়ার কোনও মানে হয় না।

—সৌমিক এখন কোথায় আছে তা জানানোর জন্যই কাল সন্ধেয় আপনাকে থানায় আসতে বলা হয়েছিল। কাল আপনার বা আপনার স্বামীর আসার সময় হয়নি। এখন বলুন তাদের দুজনকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন?

বহুক্ষণের অপেক্ষাজনিত ক্লান্তি ও থানার বিশ্রী পরিবেশের কারণে একটা বিবমিষা উত্যক্ত করে তুলেছিল বিনীতাকে। সকালে এক কাপ চা আর দু'খানা বিস্কুট ছাড়া আর কিছু পেটে পড়েনি। তখন বেরুবার সময় ভেবেছিলেন থানা থেকে ফিরে এসেই কিছু খাবেন। আসলে তখন খাওয়ার মানসিকতাটাই ছিল না। এখন বেলা একটা বাজে। খিদে প্রবলভাবে ভর করেছে শরীরে। তার ওপর ইন্সপেক্টরের এ হেন গা-জ্বালানো প্রশ্ন। বললেন, আমরা ওদের লুকিয়ে রেখেছি এ-কথা ভাবলেন কী করে আপনি?

—লুকিয়ে তো রেখেছেনই। নইলে আপনার স্বামীও তিনদিন ধরে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন?

—পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কে বলল! ব্যবসার কাজে তাকে জেলায় ঘুরতে হয় মাঝেমধ্যে। সেই কাজেই—

বিনীতার কথার মধ্যে ঝাঁঝ অগোপন থাকেনি। তাতে ইন্সপেক্টর ক্রুদ্ধ হলেন, ব্যবসার কাজে ঘুরছেন, এদিকে বাড়িতে এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল, আর উনি কোনও খবর পাননি আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? কোথায় আছে আপনার স্বামী? কোথায় আপনার ছেলে? ব্যারিস্টার রায়ের মেয়েকে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে তা এখনই একটা কাগজে লিখে দিন যতক্ষণ না তাদের খবর পাওয়া যাবে আপনাকে থানা থেকে যেতে দেওয়া হবে না।

—কী বলছেন আপনি! বিনীতা ছিটকে উঠতে চাইলেন, তারা কে কোথায় আছে তা কি আমি জেনে বসে আছি!

—আলবৎ আছেন। এ সবই আপনাদের কনস্পিরেসি। আপনি সবই জানেন, শুধু ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানেন না এমন মুখ করে বসে আছেন।

বিনীতার মুখ লাল হয়ে উঠছে ক্রমশ। ইন্সপেক্টর লোকটার কথার ধরনধারণ, চাউনি, হাসির বিস্তৃতি সবই অসহ্য চিড়বিড়ানি ধরায় শরীরে। তেতে উঠে বললেন, আপনি কিন্তু অহেতুক জুলুম করছেন আমার ওপর। আমার হাজব্যান্ড গত পরশু সকালেই বেরিয়েছিলেন। যা বলে গিয়েছিলেন তাতে আজ সন্ধের মধ্যে ফেরার কথা। কিন্তু ছেলে কোথায় সে সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা নেই। কোনও আত্মীয়স্বজনের বাড়িও যায়নি।

—ঠিক আছে, যতক্ষণ না আপনার স্বামী বা আপনার ছেলে ফিরছেন ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।

বিনীতার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। বললেন, এভাবে থানায় ডেকে এনে কোনও মহিলাকে অ্যারেস্ট করা যায় নাকি! কোনও অফেন্স না করা সত্ত্বেও!

বিনীতা চেয়ারে বসে থর থর করে কাঁপছিলেন, সমস্ত ব্যাপারটা তখনও তাঁর

বোধের অগম্য। ইন্সপেক্টরের চেম্বারের পর্দা ফাঁক করে আরও দু-চারজন উর্দিধারী মজা দেখছে দাঁত মেলিয়ে। তার মধ্যেই ইন্সপেক্টর আরও রূঢ় গলায় বললেন, ব্যারিস্টার রায়ের নাবালিকা মেয়েকে আপনারা ষড়যন্ত্র করে লুকিয়ে রেখেছেন এটাই অ্যারেস্ট করার পক্ষে যথেষ্ট অফেন্স। অ্যাই রামলাল, মিসেস দত্তকে লক-আপের বাইরে বেঞ্চিতে বসিয়ে রাখ। আর ওদের গাড়ির ভেতরে একটা ড্রাইভার ঘুমিয়ে আছে, ওটাকেও তুলে নিয়ে এসে ঢুকিয়ে দে ভেতরে। নইলে গাড়িটা নিয়ে চম্পট দেবে হয়তো। আমি খেতে যাচ্ছি।

ইন্সপেক্টরের হুকুম পাওয়া মাত্র একজন কনস্টেবল দুজন হোমগার্ড ছুটে গিয়ে ড্রাইভার চন্দনের কলার ধরে হিড় হিড় করে টেনে আনল থানার ভেতরে। তারপর চোখের পলক না ফেলতে লক-আপের দরজা খুলে তার ভেতরে প্রায় ছুড়ে দিল।

ঘুমভাঙা চন্দন বিস্ফারিত চোখে সব দেখে শুনে হতভম্ব।

কনস্টেবলটা তখন বিনীতাকে দেখিয়ে দিল একটা বেঞ্চি। বিনীতা তাতে বসতেই বিশ্রীভাবে বলল, এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করবেন না কিন্তু।

একটু পরেই ইন্সপেক্টর বুটের শব্দ তুলে বেরিয়ে গেলেন সম্ভবত তাঁর কোয়ার্টারের দিকে। বেলা সওয়া দুটো বাজে। তাঁর খিদে পায়। বিনীতা বা চন্দনের খিদে পেতে নেই। থানার ভেতরটা এতক্ষণে নিঃঝুম। একজন ডিউটি অফিসার মুখ গুঁজে একটা জাব্দাখাতায় কী সব লিখে চলেছেন একমনে। মাঝেমধ্যে বিনীতার দিকে তাকাচ্ছেন আড়চোখে। আবার মনোসংযোগ করছেন জাব্দাখাতাটার পৃষ্ঠায়। কেমন নির্বিকার, উদাসীন, নিশ্চল।

বিনীতার তখন দু'চোখ জুড়ে ডাহা অন্ধকার। ঝিম ঝিম করছে মাথাটা। উত্তেজনায় টং হচ্ছেন, কাঁপছে সমগ্র চেতনা। আচ্ছন্ন তাঁর ভাবনার জগৎটাই। তাঁর আবার হাইপ্রেসার। উচ্চচাপ পরশু গভীর রাত থেকেই বাড়তে শুরু করেছে। এখন মগডালে উঠে বসে দেখছে নীচে বিনীতার অবসন্ন, ক্ষুধার্ত, অপমানিত রিক্ত শরীরটা। এভাবে টানা সন্ধে পর্যন্ত।

সন্ধে উতরে যাওয়ার পর বিনীতার প্রতিবেশী নীলোৎপল সান্যাল খুঁজে-খুঁজে এসে থানার ভেতরে বেঞ্চিতে আবিষ্কার করলেন তাঁকে। জিজ্ঞাসাবাদের নাম করে তাঁকে এভাবে থানায় আটক করে রেখেছে সারাদিন শুনে অবাক কণ্ঠে বললেন, তা আপনি কাউকে খবরটা দেননি কেন?

বিনীতার তখন কথা বলার শক্তি নেই। অভুক্ত থেকে অপমানের চূড়ান্তে পৌঁছে ধুঁকছে তাঁর মধ্যচল্লিশের শরীর। থানার বাবুরা তখন কাছে পিঠে কেউই নেই—দু-চারজন কনস্টেবল হোমগার্ড ছাড়া। ডিউটি অফিসারও হয়তো কোথাও চা পান করতে নিষ্ক্রান্ত। বিনীতার চোখে জল এসে যাচ্ছিল। সারাদিনে কাউকে খবর দিতে

পারেননি কারণ উপায় ছিল না। একেবারে ফার্স্ট আওয়ারে যখন বেঞ্চিতে বসেছিলেন, সে সময় চন্দনকে বললে সে হয়তো খবর দিতে পারত। কিন্তু তখন বিন্দুমাত্র বুঝে উঠতে পারেননি সারাদিন এভাবে আটক থাকতে হবে থানায়। সব শুনে তাঁর প্রতিবেশী থ।

ইন্সপেক্টরের থানায় পুনরাগমন ঘটল সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ। এবার উর্দিবিহীন। সাদা শার্ট, কালো ট্রাউজার, পায়ে চপ্পল। সন্ধেয় রাস্তায় হাওয়া খেতে বেরুবার পোশাক। নীলোৎপল সান্যাল তাঁকে বিনীতার সারাদিন হেনস্থা হওয়ার কথাটা বলতেই প্রবল খ্যাকখেকিয়ে উঠলেন বড়বাবু, যান যান, আগে ঋষি দত্ত আর তার সুযোগ্য পুত্র সৌমিক দত্তকে আমার সামনে হাজির করুন, তারপর ওঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

—বাহ্, একজন ভদ্রমহিলাকে কি এভাবে সারাদিন আটক করে রাখতে পারেন আপনি! তাঁর নামে কি কোনও ওয়ারেন্ট আছে?

—যান যান, আইন দেখাবেন না। আপনার চেয়ে আমরা পুলিশের লোকেরা ঢের বেশি আইন জানি। এখন কেটে পড়ুন।

—তা জানতে পারেন। কিন্তু এক্ষেত্রে আপনি আইন মানেননি। ঠিক আছে, তা হলে আমাদের অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। বলতে বলতে নীলোৎপল সান্যাল রাগত মুখে বেরিয়ে গেলেন চটি ফটফট করতে করতে। কোথায় গেলেন বিনীতা বুঝে উঠতে পারলেন না। তাতে তাঁর আতঙ্ক আরও বেড়ে গেল। তাঁকে যদি এভাবে থানার ভেতর বাকি রাত ঠায় বসে থাকতে হয়, এভাবে নিরাপত্তাহীন, অভুক্ত, অসহায়, তা হলে কী যে ঘটবে এখানে।

বিনীতার শরীর জুড়ে তখন প্রবল বিবমিষা, উৎকণ্ঠা, আতঙ্ক, ভয়, ক্ষোভ, ক্রোধ আর কান্না। রাত ক্রমশ ঘন হয়ে আসছে। ক্রমান্বয়ে বড়বাবু, মেজবাবু, সেজবাবুর সঙ্গে কানাকানি, ফিসফাস, লেনদেন, হাসাহাসি, উৎকট গন্ধ।

বিনীতার চেতনা ক্ষীণ হয়ে আসছে ক্রমশ।

নীলোৎপল সান্যাল এলেন রাত্রি দশটা নাগাদ। সঙ্গে পাড়ার আরও মানুষজন। কয়েকজন নেতা গোছের। তারা সবাই ভীষণ উত্তেজিত। ইন্সপেক্টরের সঙ্গে কিছু বাদানুবাদ হল। পুলিশের মাধ্যমে রাষ্ট্রযন্ত্র তার রক্তচক্ষু দেখায় সাধারণ মানুষকে। সেই রক্তচক্ষুর মোকাবিলা করা বেশ দুঃসাধ্য। একা তো অসম্ভব। সমবেতভাবেও খুব কঠিন।

তবু জনতার চাপ শেষ পর্যন্ত অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়ায়। তাদের চাপে মচকালেন বড়বাবু, তবু ভাঙলেন না। বললেন, ঠিক আছে, ওঁদের দুজনকে আপাতত ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু গাড়িটা সিজ করলাম। যতক্ষণ না সৌমিক দত্তকে খুঁজে পাওয়া যায়

ওটা আমাদের জিম্মায় থাকবে। নিন, মিসেস দত্ত, এই সাদা কাগজটায় একটা সই করে দিন।

বিপর্যস্ত, শ্রান্ত বিনীতা বাড়ি ফিরতে ফিরতে প্রায় ভেঙে পড়লেন, বুঝলেন আমার ছেলে এভাবে না বলে পালানোর ছেলে নয়। ওই মেয়েটাই চাপ দিচ্ছিল অনেকদিন ধরে। তার চাপেই—

৪

সৌমিক-উৎসার অন্তর্ধান সম্পর্কিত প্রাথমিক ঝড়-ঝঞ্ঝাটের পর বিনীতা দত্তর পক্ষ থেকে একটা অভিযোগপত্র পৌঁছল রাজ্যের মানবাধিকার কমিশনের অফিসে। নীলোৎপল সান্যালই উদ্যোগ নিয়ে লিখলেন চিঠিটা, তার নীচে বিনীতার সই। মাসদুয়েক অবশ্য কোনও সাড়াশব্দ নেই। সৌমিক-উৎসার কোনও খোঁজখবর পাওয়া যায়নি, শুধু দুজনের বাড়িতে দু'খানা চিঠি এসেছিল, তাতে জানিয়েছে উৎসা রীতিমতো সাবালিকা তরুণী, স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছে সৌমিককে। থানা-পুলিশ কোর্ট-কাছারি করে যেন অযথা হয়রানি না করা হয় তাদের। পুলিশ অবশ্য আর অনুসন্ধান করছেও না। তবে বিনীতাদের অ্যাম্বাসাডার গাড়িটি থানায় বহাল তবিয়তে আছে, সেটি ইচ্ছেমতো ব্যবহার করছেন থানার বাবুরা।

দু'মাস পরে একটা সরকারি সিলমোহর দেওয়া চিঠি আসতে জানা গেল ইতিমধ্যে মানবাধিকার কমিশন তাঁদের নিজস্ব তদন্তকারী টিম পাঠিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করেছেন। আগামী এক সপ্তাহ পরে মামলাটির শুনানি হবে কমিশনের এজলাসে। সেখানে বিনীতা দত্ত ও ড্রাইভার চন্দন যেন যথাসময়ে উপস্থিত থাকেন।

ব্যাপারটা এতখানি ফলপ্রসূ হবে, এত দ্রুত তা যেন উদ্যোক্তা নীলোৎপল সান্যালও ঠিক উপলব্ধি করতে পারেননি। রাষ্ট্রযন্ত্র বোধহয় মাঝেমধ্যে খুঁজে পায় তার বিবেক। পুলিশের নিপীড়নের ইতিহাস যেমন যথানিয়মে চাপা পড়ে যায় এবার কেন যেন তা হল না। কয়েকদিন পরেই দেখা গেল আসামির ভূমিকায় অবতীর্ণ স্বয়ং পুলিশ ইন্সপেক্টর। কমিশনের সঙ্গে তাঁর যে কিঞ্চিৎ বিশ্রম্ভালাপ হল তা এইরকম :

—আপনি কি জনৈকা শ্রীমতী বিনীতা দত্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য থানায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

—আপনি একজন দায়িত্বপূর্ণ পুলিশ অফিসার। আপনার ওপর একটা থানা এলাকার নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া আছে তা নিশ্চয়ই জানেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার।

—আপনি কি ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোডের ১৬০ ধারাটি পড়েছেন?

—(নিরুত্তর)

—আপনি শুধু এই আইনটাই ভেঙেছেন তাই নয়। একজন শিক্ষিত ভদ্রমহিলাকে সারাদিন অভুক্ত অবস্থায় বসিয়ে রেখেছেন থানায়। তার ওপর অসম্ভব মানসিক অত্যাচার করেছেন। এমনকী তাঁর এই সারাদিনের উপস্থিতি থানার রেজিস্টারে রেকর্ড পর্যন্ত করা হয়নি।

—(নিরুত্তর)

—শুধু তাই নয়, তাঁদের একটা অ্যাম্বাসাডার গাড়ি আটক করে রেখেছেন থানায়।

—স্যার, গাড়িটা রাস্তায় বেওয়ারিস পড়ে থাকতে দেখেন আমাদের সাব-ইন্সপেক্টর। তিনিই দুজন সাক্ষী রেখে গাড়িটা সিজ করে নিয়ে আসেন থানায়।

—হুঁ, থানার রেজিস্টারের জি.ডি. এন্ট্রিতে তাই লেখা আছে বটে। কিন্তু ঠিক কোন জায়গায় গাড়িটা পাওয়া গেছে তা পরিষ্কার করে লেখা নেই কেন!

—স্যার, জি.ডি. এন্ট্রিতে ওটা লিখতে ভুল হয়ে গেছে। গাড়িটা সিজ করার সময় সাব-ইন্সপেক্টর দুজন সাক্ষী রেখেছিলেন সেটা স্যার নিশ্চয়ই আপনি দেখেছেন।

—হ্যাঁ। দুজন সাক্ষীর একজন রতন মালাকার। একটা স্কুটার রিপেয়ারিং শপে মিস্ত্রির কাজ করে, যে-দোকানে সাব-ইন্সপেক্টর তাঁর স্কুটার সারান। অন্যজন পরাশর মল্লিক। থানার একজন হোমগার্ডের ভাই। তার একটা চায়ের দোকান আছে।

—হ্যাঁ, স্যার। তাদের দুজনকে সাক্ষী রেখেই—

—দুজন সাক্ষীর বাড়ি বা তাদের দোকানের মধ্যে প্রায় তিন কিলোমিটারের ব্যবধান। এটা বোঝা গেল না তারা দুজনে একই সময়ে, একই জায়গায় সাক্ষী হওয়ার জন্য মিলিত হল কী করে!

—স্যার, দুজনকেই পথচারী হিসেবে সই করানো হয়েছে।

—কমিশনের তদন্তকারী টিম দুজন সাক্ষীকেই জেরা করেছিল। দুজনেই জানিয়েছে থানার মেজবাবু তাদের থানায় ডেকে একটা সাদা কাগজের নীচে সই করতে বলেন। কাগজে পরে কী লেখা হয়েছে তা ওরা জানে না। অ্যাম্বাসাডারের ব্যাপারেও তাদের কিছু জানা নেই।

—(নিরুত্তর)

—তা ছাড়া কোনও 'আনক্লেমড় প্রপার্টি' থানায় সিজ করা হলে নিয়ম আছে যে, সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের থানা-এলাকায় গাড়িটির বর্ণনা ও নম্বর জানিয়ে দেওয়া।

গাড়িটা কারও বাড়ি থেকে চুরি করা হয়েছে কি না, কিংবা ওটি কোনও অপরাধমূলক কাজে ব্যবহৃত হয়েছে কি না তা জানার জন্যেই। এক্ষেত্রে তা করা হয়নি।

—(নিরুত্তর)

—আপনার বিরুদ্ধে আরও দুটো অভিযোগ আছে। এক. গাড়িটি বেআইনিভাবে থানায় আটক করে রেখে গত দু'মাস আপনি বা থানার অন্য অফিসারেরা যথেচ্ছভাবে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেছেন। দুই. গাড়ির ড্রাইভারকে অন্যায়ভাবে একদিন পুলিশ লক-আপে রেখে দিয়েছেন, জি.ডি. রেজিস্টারে তার এন্ট্রি নেই।

—(নিরুত্তর)

রাষ্ট্রযন্ত্রের একটি চোখ তখন রক্তবর্ণ হয়ে তাকিয়ে আছে রাষ্ট্রযন্ত্রের আর একটি চোখের দিকে। নিপাট ভদ্রলোকের মতো চেহারা। শুধু উর্দি পরলেই তার ব্যবহার চালচলন সব ম্যাজিকের মতো বদলে যায়। ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। কী করে এহেন নিষ্ঠুর দ্বিতীয় চোখটিকে উপড়ে ফেলা যায় প্রথম চোখ তাইই ভেবে চলেছে কলম উদ্যত করে।